তথ্যপ্রযুক্তিতে বাড়াতে হবে নারীর অংশগ্রহণ

রাজিব আহমেদ ও এস.এম. মেহদী হাসান

মাত্র দশ-পনেরো বছর আগেও কমপিউটার তথা আইসিটি ক্ষেত্রে মূলত পুরুষদেরই বিচরণ ছিল। এর একটা বড় কারণ হচ্ছে, এ খাতে যারা শিক্ষা, চাকরি ও ব্যবসায় নিয়োজিত তাদের বেশিরভাগই ছিলেন পুরুষ। গত কয়েক বছরে এ চিত্র ধীরে ধীরে পাল্টে যেতে শুরু করে। এখন এক্ষেত্রে নারীরাও এগিয়ে এসেছেন। আইসিটি খাতে মেয়েরা কেমন লেখাপড়া, চাকরি ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে কতটুকু সংশি-ষ্ট, সেটা এখন ভাবার বিষয়। মূলত এসব প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রেখেই কমপিউটার জগৎ এবারের প্রচ্ছদ প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এক্ষেত্রে নানা ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। বাংলাদেশে গ্রামীণফোন এক দশকেরও বেশি আগে গ্রামীণ মহিলাদের মোবাইল ফোন দিয়েছিল, যাতে এরা মোবাইল ফোন ব্যবহার করে উদ্যোক্তা হতে পারেন। এ ধরনের প্রকল্প জনপ্রিয় হয়েছে সেনেগাল, মরক্কো বা ঘানাতে। সেখানে মহিলারা খুব অল্প পুঁজি নিয়ে মোবাইল ফোনের দোকান চালু করেছেন। আইসিটি ব্যবহার করে বিশেষ করে মেয়েদের জন্য ব্যবসায়িক উদ্যোগ নেয়ার একটি বড় সুবিধা হচ্ছে, এতে অল্প পুঁজি লাগে।

যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সাহায্য সংস্থা ইউএসএইড বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মহিলাদের ভাগ্যোন্নয়নে আইসিটির ব্যবহারে কয়েকটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এ প্রকল্পগুলো এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পগুলোর উদ্দেশ্য একদিকে যেমন নারীদের তথ্য পাওয়া নিশ্চিত করা, অন্যদিকে নারীদের বিরুদ্ধে বিদ্যমান বৈষম্য সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে সাহায্য করা। সর্বোপরি আইসিটি ব্যবহার করে নারীরা জীবনে তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন করতে পারেন, সে সম্পর্কে সহযোগিতা করা। নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টিও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, নারীর ক্ষমতায়ন যদি আমরা নিশ্চিত করতে চাই, তবে অবশ্যই তাদের তথ্য পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে সবার আগে।

(আরও তথ্য : http://www.usaid.gov/our_work/cross-cutting_programs/wid/ict/index.html)

বাংলাদেশে আইসিটি খাতের দিকে তাকালে দেখা যাবে, এক্ষেত্রে এখনও পুরুষের দাপট। মেয়েরা বেশ পিছিয়ে। ঢাকার আইডিবি মার্কেট ও এলিফ্যান্ট রোডের কমপিউটারের দোকানগুলোতে গেলে দেখা যায় প্রায় ৮০-৯০ শতাংশ কর্মকর্তা-কর্মচারীই পুরুষ। অনেক দোকানে কোনো নারীকে কর্মকর্তা-কর্মচারী হিসেবে দেখা যায় না। বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতির সদস্য তালিকায় নারী-উদ্যোক্তার সংখ্যা হাতেগোনা। একই কথা খাটে বেসিসের সদস্যদের ক্ষেত্রেও। আর কমপিউটার প্রকৌশল, কমপিউটার বিজ্ঞান ও টেলিযোগাযোগ প্রকৌশলের মতো বিষয়গুলোতে এখনও বাংলাদেশে নারীদের তেমন প্রবেশ ঘটেনি। অনেকে আবার মনে করেন, মেয়েদের বেশি করে আর্টস পড়া উচিত। আর ছেলেরা বিজ্ঞান পড়বেন। অবশ্য সময়ের সাথে এ ধারণা বদলাতে শুরু করেছে। আগামী দশ বছর পরে হয়তো আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং ও কারিগরি ক্ষেত্রে উলে-খযোগ্যসংখ্যক মেয়েকে দেখতে পাব এবং এরাই এক সময় আইসিটিসংশি-ষ্ট কর্মজীবনে প্রবেশ করে এ চিত্র পুরোপুরি পাল্টে দেবেন।

আইসিটি জগতে নারীদের অবস্থান

আগেই উলে-খ করা হয়েছে বিজ্ঞান এবং তথ্যপ্রযুক্তিকে সামগ্রিকভাবে এখনো ছেলেদের বিষয় বলে গণ্য করা হয়। তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে, বিশ্বের প্রথম কমপিউটার প্রোগ্রামার ছিলেন একজন নারী, অ্যাডা লাভলেস- যিনি কমপিউটারের জনক হিসেবে খ্যাত চার্লস ব্যাবেজের 'অ্যানালাইটিক্যাল ইঞ্জিন' নামের যন্ত্রের জন্য প্রোগ্রাম লিখেছিলেন।

কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, এই একবিংশ শতাব্দীতে এসেও বিজ্ঞান ও আইসিটি খাতে নারীদের অবস্থান সুদৃঢ় নয়। প্রযুক্তি খাতে উৎকর্ষতা বিবেচনায় যে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান শীর্ষে সেই যুক্তরাষ্ট্রেও আইসিটি খাতে নারীদের অংশ নেয়া আশানুরূপ নয়। ২০০৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রে কমপিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি অর্জনকারীদের মধ্যে মাত্র ২০ শতাংশ নারী, যা ২০০৮ সালে ১৮ শতাংশে নেমে আসে। বিষয়টি আরেকটু স্পষ্ট করার জন্য যোগ করছি : ২০০৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রে সব বিষয়ে যে পরিমাণ স্নাতক ডিগ্রি দেয়া হয় তার ৫৮ শতাংশ অর্জন করেছেন নারীরা। ২০০৭ সালে প্রকাশিত আরেকটি রিপোর্টে উলে-খ করা হয় যুক্তরাষ্ট্রে সব পেশাগত চাকরিতে নারীদের আধিক্য থাকলেও সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে মাত্র ২২ শতাংশ নারী কর্মরত আছেন।

এবার নজর দেয়া যাক ইউরোপের দিকে। ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত ২৭টি দেশের ওপর পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, ১৫ বছর বয়সী ছেলে এবং মেয়েদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে দক্ষতা মোটামুটি একই, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এসে কমপিউটার বিজ্ঞান বিষয়ে একজন মেয়ের বিপরীতে ছেলের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬-এ। প্রযুক্তি খাতে গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে মেয়েদের সংখ্যা ২০ শতাংশের কম।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোতে কমপিউটার বিজ্ঞান বিষয়ে ১৯৯৮ থেকে ২০০৪- এই সাত বছরে যারা গ্র্যাজুয়েট হয়েছেন, তাদের মধ্যে কত শতাংশ নারী এবং কত শতাংশ পুরুষ তার একটি তুলনামূলক বিশে-ষণ ইউরোস্টাট থেকে নেয়া বারগ্রাফের মাধ্যমে নিচে দেয়া হলো। সর্বোপরি ২০০৫ সালের ইউনেস্কো পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা যায়, বিশ্বে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিষয়ে নারী স্নাতকের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকা ও ব্রাজিলে। তবে তাও মাত্র ৩৭ শতাংশ।

নারীর প্রতি বৈষম্য

আইসিটি খাতে নারীদের প্রতি বৈষম্য বিশ্বে এখনও যথেষ্ট প্রবল। তথ্যপ্রযুক্তিতে পেশাজীবন গড়ার ক্ষেত্রে একজন নারীকে সমাজের বিভিন্ন স্তরে অনেক বাধার মুখোমুখি হতে হয়। 'ছেলেদের কাজ' বলে ধরে নিয়ে প্রথমেই পরিবার থেকে বাধা আসে। অনেকের পক্ষেই সমাজে প্রচলিত এই বিশ্বাসকে ভেঙে আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তথ্যপ্রযুক্তি খাতে পেশাজীবন গড়া সম্ভব হয় না।

পাশাপাশি আইসিটি খাতে নারীদের সংখ্যা কম হওয়ার আরেকটি বড় কারণ হচ্ছে উপযুক্ত কাজের পরিবেশের অভাব। ইউরোপীয় ইউনিয়নের 'উইমেন অ্যান্ড আইসিটি স্ট্যাটাস রিপোর্ট ২০০৯' অনুসারে ফরচুন ম্যাগাজিনে প্রকাশিত বিশ্বের ৫০০ বড় কোম্পানির বোর্ডে মাত্র ১৩ জন নারী রয়েছেন এবং এদের মধ্যে মাত্র একজন প্রযুক্তি ক্ষেত্রে কাজ করছেন।

আইসিটিবিষয়ক প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবস্থাপনায় নারীদের সংখ্যা নিতান্তই কম হওয়ায় এই ক্ষেত্রে কর্মরত নারী চাকরিজীবীদের জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরি করার বিষয়টি নিয়ে ভাবা হচ্ছে না। ফলে মাতৃত্বকালীন ছুটি থেকে শুরু করে বেতন পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে নারীরা বৈষম্যের শিকার। আইসিটি খাতে নারীদের অংশ নেয়ার সমান সুযোগ না থাকার পেছনে অন্যতম আরেকটি কারণ বেতন বৈষম্য। ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোতে যেসব নারী পদার্থ, গণিত, প্রকৌশল ক্ষেত্রে চাকরি করছেন, তারা বেসরকারি খাতে তাদের পুরুষ সহকর্মীদের চেয়ে ২২ শতাংশ বেতন কম পাচ্ছেন। ২৯ শতাংশ বেতন কম পাচ্ছেন সরকারি খাতে। প্রযুক্তি খাতে এ বৈষম্যের পরিমাণ বেসরকারি খাতে ২৬ শতাংশ এবং সরকারি খাতে ২৭ শতাংশ। এজন্যই অনেক নারী আইসিটি খাতে এসেও পরবর্তী সময়ে অন্য ক্ষেত্রে চলে যান। ▸

‘আইসিটিতে নারীরা কোনোভাবেই পিছিয়ে থাকতে পারেন না’

ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী এমপি
প্রতিমন্ত্রী, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

আইসিটি সেক্টরে নারীর অংশগ্রহণ নিয়ে আপনার মন্ত্রণালয় কী ভাবছে?

২০০৮ সালে নির্বাচনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে সরকার গঠন করে ২০২১ সালের রূপকল্প ঘোষণা করেছেন এবং সেই সাথে বাংলাদেশকে ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ হিসেবে গড়ে তোলার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার এই ভিশন বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে অনেক ধরনের কার্যক্রমও ইতিমধ্যে হাতে নেয়া হয়েছে। আমরা যখন নারী ক্ষমতায়নের কথা বলি এবং উন্নয়নের মূল ধারায় সম্পৃক্তকরণের কথা বলি তখন ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রক্রিয়ায় নারীদের সম্পৃক্ত করার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেই কারণেই আইসিটি সেক্টরে যাতে আমরা নারীদেরকে সম্পৃক্ত করতে পারি, তাদেরকে নানা ধরনের সুযোগ সুবিধা দিয়ে আইসিটি প্রক্রিয়ায় ইতিবাচক দিকগুলোর সুবিধা গ্রহণে উৎসাহিত করতে পারি সে বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় কী নারীরা পিছিয়ে পড়ছেন না?

এমনটি মনে হওয়ার কোনো কারণ নেই। ডিজিটাল বিভাজন যাতে সৃষ্টি না হয়, সে বিষয়ে সরকার মনোযোগী। দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের প্রক্রিয়ায় তাদেরকে সম্পৃক্ত করার বিষয়ে উদ্যোগ নেয়া হবে। এই প্রক্রিয়ায় নারীদের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা আমাদের মূল লক্ষ্য। ভবিষ্যৎ নির্মাণে আইসিটির একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এবং আইসিটি ক্ষেত্রে নারীদের অবশ্যই এগিয়ে আসতে হবে।

‘নারীর ক্ষমতায়নে আইসিটির ব্যবহার’ বিষয়ে আপনার মন্ত্রণালয়ের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী?

আমাদের নারী উন্নয়নের দুটো প্রধান কার্যক্রমের একটি হচ্ছে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ এবং আরেকটি হচ্ছে প্রকল্প গ্রহণ। আইসিটি সেক্টরে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, দেশের তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত নারীদেরকে এই বিষয়ে দক্ষ করে তোলা, শিক্ষিত করে তোলা। শুধু দক্ষ-শিক্ষিতই নয়, এর পাশাপাশি তাদেরকে সার্বিকভাবে পরিচিত করে তোলা। এটা ব্যবহারে যে উপকারগুলো হয় সেই উপকারগুলো তারা কীভাবে পেতে পারে, সে ব্যাপারে তাদেরকে সচেতন করে তোলাই আমাদের এই কর্মসূচি ও প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। এই সামগ্রিক বিষয়গুলোকে সামনে রেখে আমরা বিশেষ কর্মসূচি ও প্রকল্প হাতে নিয়েছি। আমাদের ‘তথ্য আপা’ প্রকল্প বর্তমানে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে আছে অনুমোদনের জন্য। এ প্রকল্প জাতীয় মহিলা সংস্থার মাধ্যমে শুরু করব বলে আশা করছি। প্রথম পর্যায়ে পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে দশটি উপজেলায় এ প্রকল্প শুরু হবে। দশটি উপজেলা কমপে-ক্সে খোলা হবে একটি করে তথ্যকেন্দ্র। ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে সেখানে নানা ধরনের তথ্যের যোগান দেয়া হবে। সরকার নারীর উন্নয়নে ব্যাপক কার্যক্রম চালাচ্ছে। সরকার নারীদের জন্য কী কী সুযোগসুবিধা দিচ্ছে– তা জানাতে তথ্যকেন্দ্র স্থাপন জরুরি। সে জন্য তথ্য আপা হিসেবে প্রতি উপজেলায় দুইজন করে দশটি উপজেলায় মোট ২০ জন নারীকে নিয়োগ দেয়া হবে এবং তারা নারীদের দোরগোড়ায় আইসিটির সেবা যোগাবেন। ক্ষুদ্র ও মাঝারি নারী উদ্যোক্তারা যাতে ই-কমার্সের মাধ্যমে তাদের পণ্য বিক্রির সুযোগ পান সে বিষয়ের পদক্ষেপ নেয়া হবে।

আমাদের মন্ত্রণালয় ৩০টি জেলায় মহিলাদেরকে কমপিউটার প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। আগামী জুলাইয়ে এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সম্পন্নসারিত করা হবে।

আইসিটি সেক্টরে নারীদের অংশগ্রহণের ব্যাপারে একটি অন্যতম বড় বাধা হচ্ছে চাকরি ক্ষেত্রে উপযুক্ত কাজের পরিবেশের অভাব। এক্ষেত্রে নারীদের জন্য আইসিটি সেক্টরে একটি সহায়ক কাজের পরিবেশ তৈরিতে কী ধরনের পদক্ষেপ নেয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?

এখন সারা বিশ্বেই তথ্যপ্রযুক্তি, ইন্টারনেট, আইসিটি এগুলোর ব্যবহার ছাড়া আপনি কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই অগ্রসর হতে পারবেন না। আপনার পেশা যাই হোক না কেন, আপনি যদি একজন আইনজীবী বা একজন চিকিৎসকও হোন বা অন্য যেকোনো পেশাই নিয়োজিত থাকেন, সব ক্ষেত্রেই উন্নতির জন্য আইসিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুতরাং এ ব্যাপারে দক্ষতা সকলেরই প্রয়োজন। তাই আমাদের মনে হয়, সরকার স্কুল-কলেজ পর্যায়ে কমপিউটার ল্যাব স্থাপন থেকে শুরু করে আইসিটি সেক্টরে ছেলেমেয়েদের উৎসাহিত করা এবং তাদেরকে সুযোগ তৈরি করে দেয়ার মাধ্যমে যে কাজটি করছে তা ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা রাখবে। তাছাড়া সরকার যেহেতু মেয়েদের ব্যাপারে বিশেষভাবে মনোযোগী, তাই নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পরবর্তীতে আইসিটি সেক্টরের বিভিন্ন পেশায় তাদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা হবে এবং এক্ষেত্রে সরকারের নেয়া এসব কার্যক্রমের একটি বড় ভূমিকা থাকবে। এভাবেই একদিন বাংলাদেশে নারীদের জন্য আইসিটি সেক্টরে একটি সহায়ক কাজের পরিবেশ তৈরি হবে বলে আমি আশাবাদী।

বদলে যাচ্ছে চালচিত্র

উপরোল্লি-খিত বিভিন্ন সমস্যা থাকা সত্ত্বেও এটা অবশ্যই বলা যায়, আইসিটি খাতে মেয়েদের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে সাম্প্রতিক সময়ে এর কিছু লক্ষণ দেখা গেছে। যেমন ২০০২ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত সময়ে ইউরোপে প্রতিবছর নারী বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীদের সংখ্যা ৬.২ শতাংশ হারে বেড়েছে, যেখানে ছেলেদের এই বেড়ে চলার হার ছিল মাত্র ৩.৭ শতাংশ। এছাড়া আরেকটি উলে-খযোগ্য বিষয় হচ্ছে, ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোতে ২০০৪ সালে নারী রিসার্চ গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা যেখানে ২০ শতাংশ বেড়েছে, সেখানে পুরুষ গবেষক স্নাতকদের সংখ্যা কমেছে ৮০ শতাংশ।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে আইসিটি খাতে নারীদের অংশ নেয়ার হার ইউরোপের অন্য দেশগুলোর তুলনায় অনেক বেশি, যদিও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো অর্থনৈতিকভাবে অনেকটাই পিছিয়ে। এস্তোনিয়া, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, পোল্যান্ড ও লাটভিয়ায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে নারী স্নাতকের সংখ্যা ইউরোপের অনেক উন্নত দেশ যেমন– অস্ট্রিয়া, জার্মানি ও ফ্রান্সের চেয়ে অনেক বেশি।

এ থেকে প্রমাণ হয়, তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে থাকা পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোতে নারীরা আইসিটি খাতের সম্ভাবনা বিশেষ করে অর্থনৈতিক সম্ভাবনা অনুধাবন করতে পারছেন এবং এক্ষেত্রে কর্মজীবন ও পেশাজীবন গড়ার কথা ভাবছেন। এছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে নিয়োজিত নারীরা নিজেদের অবস্থা সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সংগঠন গড়ে তুলছেন। এমনি একটি সংগঠন হচ্ছে আফ্রিকাচিক্স http://akirachix.com। এটি কেনিয়ার আইসিটি সেক্টরে নিয়োজিত নারীরা তৈরি করেছেন।

আইসিটি চাকরিতে নারীরা

বিশ্বের প্রায় সব দেশেই কমপিউটার এবং তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বর্তমানে প্রচুর কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে। তবে উচ্চপ্রযুক্তির চাকরিতে দক্ষ লোকের অভাব ইউরোপ-আমেরিকাতেও থেকে গেছে। গবেষণা সংস্থা গার্টনারের মতে, ২০০৭ থেকে ২০১২ পর্যন্ত পাঁচ বছরে বিশ্ব আইসিটি বাজারের পরিমাণ ৫.৭ শতাংশ বাড়বে। এতে প্রমাণ হয়, আইসিটি খাতে আসছে বছরগুলোতে নতুন নতুন চাকরি সৃষ্টি হবে।

আশার কথা, নারীরা আইসিটিতে পুরুষদের তুলনায় পিছিয়ে থাকলেও ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে তারা পিছিয়ে নেই। ইইউভুক্ত দেশগুলোতে ১৬-২৪ এবং ২৫-৫৪ বছর বয়সী ছেলে ও মেয়ে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় সমান। অবশ্য ছেলেদের সংখ্যা সামান্য বেশি। আশার কথা, আইসিটি খাতে ওয়েবভিত্তিক এমন অনেক চাকরি বা কাজ রয়েছে, যেগুলো ঘরে বসেই করা সম্ভব। আর নারীরা যেহেতু ইন্টারনেট ব্যবহারে খুব একটা পিছিয়ে নেই, তাই এ ধরনের কর্মসংস্থানে তাদের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

বাড়ছে ইন্টারনেটে নারীদের উপস্থিতি

বিশ্বের বড় বড় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্র হচ্ছে আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের অন্তর্গত সিলিকন ভ্যালি। সেখানে বর্তমানে প্রযুক্তির কাজে নিয়োজিত চাকরিজীবীদের মাত্র ২০ শতাংশ নারী। এখানে আরেকটি তথ্য যোগ করতে চাই, বিখ্যাত ফরচুন ম্যাগাজিনের মতে বিশ্বের ৫০০ বড় প্রতিষ্ঠানের মাত্র ১৫টিতে নারী সিইও প্রধান নির্বাহী রয়েছেন।

উপরোল্লি-খিত তথ্য দুটি থেকে এটাই প্রতীয়মান ▶

হয়, প্রযুক্তিনির্ভর চাকরিতে নারীদের অবস্থান এখনও সুসংহত নয়। কিন্তু আশ্চর্যজনক হলেও সত্যি, ইন্টারনেটে নারীদের সরব উপস্থিতি রয়েছে। ওয়েবভিত্তিক বিভিন্ন সার্ভিসে নারীরাই বর্তমানে মূল অনুঘটকের ভূমিকা পালন করছেন। বিশেষ করে সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটগুলোতে নারীদের উপস্থিতি এমনকি ছেলেদের চেয়েও বেশি। আজকের বিশ্বে খুব কম লোকই আছেন, যারা ফেসবুক ও টুইটারের মতো সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটের সাথে পরিচিত নন। বর্তমানে বিশ্বে ফেসবুকের সদস্যসংখ্যা ৬০ কোটিরও বেশি। টুইটারে গত বছর সর্বমোট আড়াই হাজার কোটি টুইট পোস্ট করা হয়েছে। এছাড়া টাম্বলারে প্রতি সপ্তাহে ১০০ কোটি পেজ ভিউ হয়। সোশ্যাল গেমিং নেটওয়ার্কিং সাইট 'জিঙ্গা' মাত্র ৬ সপ্তাহে ১০ কোটি সদস্য পেয়ে গেছে।

উপরোলি-খিত সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটগুলোর সাফল্যের অন্যতম কারণ নারীদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি। বিভিন্ন বাজার গবেষণা প্রতিষ্ঠান যেমন– কমস্কোর, নিয়েলসন, মিডিয়ামাত্রিক্স ও কোয়ান্টকাস্টের মতে, এসব নেটওয়ার্কিং সাইটের প্রাণ হচ্ছেন নারী। যেমন– কমস্কোর দেয়া তথ্য অনুযায়ী নারীরা পুরুষদের তুলনায় ৩০ শতাংশ বেশি সময় ব্যয় করেন সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটগুলোতে। অন্যদিকে নিয়েলসনের মতে, মোবাইল সোশ্যাল নেটওয়ার্কিংয়ে নারীদের অবদান ৫৫ শতাংশ।

এখানে সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটগুলোতে নারীদের অবস্থান সম্পর্কিত আরও কয়েকটি তথ্য উপস্থাপিত হলো :

০১. ফেসবুকের অ্যাকটিভিটি যেমন– মেসেজ, আপডেট, কমেন্টস ইত্যাদিতে নারীদের অবদান ৬২ শতাংশ এবং এই সাইটটির ৭১ শতাংশ দৈনন্দিন ফ্যান অ্যাকটিভিটিতে নারীদের অংশগ্রহণ রয়েছে।

০২. ফেসবুকে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের বন্ধুর সংখ্যা ৮ শতাংশ বেশি। ফেসবুকের তিনটি প্রধান ফিচার– ওয়ালে পোস্ট করা, ছবি অ্যাড করা এবং বিভিন্ন গ্রুপে যোগ দেয়া জনপ্রিয় করার পেছনে মেয়ে ব্যবহারকারীদের অবদান সবচেয়ে বেশি।

০৩. সোশ্যাল গেমিং সাইট জিঙ্গায় নারী গেমারের সংখ্যা ৬০ শতাংশ এবং অ্যাভারেজ গেমার হচ্ছেন একজন ৪৩ বছরের নারী।

০৪. জনপ্রিয় সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট টুইটারেও নারী ব্যবহারকারীদের অবদান ছেলেদের তুলনায় অনেক বেশি।

এত গেল সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটের কথা। এবার নজর দেয়া যাক ই-কমার্স বা শপিং সাইটগুলোর দিকে। নামকরা ই-কমার্স সাইট, যেমন– জাপোস, গ্রুপন, জিল্ট গ্রুপ, ইটসি এবং ডায়াপারসের বেশিরভাগ ক্রেতা নারী।

ই-কমার্স সাইটগুলোতে নারীরা এতটাই সক্রিয় যে অ্যামাজন.কম গত বছর 'অ্যামাজন মম' নামে একটি নতুন প্রোগ্রাম চালু করেছে এবং এরা ১৮৩ কোটি ডলারের বিনিময়ে জাপোস এবং কুইডসির (যেটি ডায়াপারস.কম, বিউটিবার.কম, এবং সোপ.কমের মূল প্রতিষ্ঠান) মতো জনপ্রিয় সাইট কিনে নিয়েছে। জিল্ট গ্রুপের ভাষ্যমতে, প্রতিষ্ঠানটির ৭০ শতাংশ ক্রেতা নারী। আর লাভের ৭৪ শতাংশ আসে নারী ভোক্তার মাধ্যমে। গ্রুপনের ৭৭ শতাংশ ভোক্তাও নারী।

এটি মোটামুটি স্পষ্ট, সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং ও ই-কমার্স সাইটগুলোর সাফল্যের পেছনে সবচেয়ে বেশি অবদান নারীদের। ফলে এই সাইটগুলোর

'ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ায় নারীর ভূমিকা অপরিসীম'

অধ্যাপক মমতাজ বেগম, চেয়ারম্যান, জাতীয় মহিলা সংস্থা

জাতীয় মহিলা সংস্থার প্রতিদিনের কাজে আইসিটি কতটা গুরুত্ব পায়?

জাতীয় মহিলা সংস্থা সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে ইতোমধ্যে নিজস্ব ওয়েবসাইট চালু করেছে। সংস্থার 'পত্র গ্রহণ ও জারি শাখা' কমপিউটারাইজড করা হয়েছে। এর সব শাখায় কমপিউটারের ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে। খুব শিগগিরই সংস্থার যাবতীয় হিসাব সংরক্ষণে সফটওয়্যার ব্যবহার করা হবে।

এছাড়া মাঠ পর্যায়ে সব জেলা ও উপজেলা শাখায় কমপিউটার সরবরাহ করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে সব জেলার সাথে নেটওয়ার্ক স্থাপন করার চিন্তাভাবনা রয়েছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশে নারীর গুরুত্ব কতখানি?

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ায় নারীর ভূমিকা অপরিসীম। বঙ্গবন্ধু নারীর ক্ষমতায়নে পৃথক সাংগঠনিক কাঠামো সৃষ্টির নির্দেশ দিলে সমাজসেবা অধিদফতরের পরিচালকের নেতৃত্বে একটি কমিটির প্রস্তাবিত রূপরেখা অনুযায়ী এ সংস্থা গঠিত হয়। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ায় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা বিবেচনায় রেখেই এই সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেকই যেখানে নারী, তখন ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ায় নারীর গুরুত্বের কথা উলে-খের অপেক্ষা রাখে না।

নারীদের সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ডিজিটাল বাংলাদেশ কতটা সুফল বয়ে আনতে পারবে?

অবশ্যই সুফল বয়ে আনবে। নারীর সহযোগিতা ছাড়া যেমন স্বাধীনতা অর্জিত হয়নি, তেমনি ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ায় নারীর ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় মহিলা সংস্থার উদ্যোগে একটি প্রকল্পের মাধ্যমে ৩০টি জেলায় মহিলাদের কমপিউটার প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। অপর একটি কর্মসূচির মাধ্যমে অবশিষ্ট ৩৪টি জেলায় কমপিউটার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এই দুটি প্রকল্প বা কর্মসূচির মাধ্যমে বছরে কয়েক হাজার মহিলাকে আধুনিক প্রযুক্তির সাথে যুক্ত করা হচ্ছে। এর ফলে বাংলাদেশের নারীসমাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়ন ঘটবে, যা বাংলাদেশকে উন্নতির পথে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে।

আপনারা আইটি প্রকল্পের আওতায় মহিলাদের কমপিউটার প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। এখন এ প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে আপনারা আছেন। এ প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে আমাদের কিছু বলবেন কি?

বর্তমান বিশ্বে কমপিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি উন্নয়নের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। শিক্ষিত নারীর কর্মদক্ষতা বাড়ানো ও শিক্ষিত বেকার মহিলাদের কর্মসংস্থানের জন্য কমপিউটার ও তথ্য-যোগাযোগ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য জেলাভিত্তিক মহিলা কমপিউটার প্রশিক্ষণ প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায় গৃহীত হয়েছে। নারীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে তাদের ক্ষমতায়নে সহায়তা করার জন্য বাংলাদেশ এই ৩০টি জেলাকেন্দ্রের মাধ্যমে ১৫ হাজার শিক্ষিত মহিলাকে কমপিউটার ও আইসিটি বিষয়ে তিন মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। এ পর্যন্ত ৭৯৯৪ জন মহিলাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এখান থেকে প্রশিক্ষণ শেষে কিছুসংখ্যক প্রশিক্ষণার্থী ইউআইএসসি ও বিসিসির আইটি সেলসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন। প্রকল্পের মেয়াদ আগামী জুন ২০১২ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। এতে ব্যয় হচ্ছে ১৬ কোটি ৭৫ লাখ ৪৭ হাজার টাকা।

আপনাদের 'তথ্য আপা' প্রকল্প সম্পর্কে কিছু বলুন।

তথ্য ও জ্ঞানের রাজ্যে নারীর সহজ প্রবেশ নিশ্চিত করার জন্য জাতীয় মহিলা সংস্থা জুলাই ২০১১ থেকে 'তথ্য আপা : ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন' নামে তিন বছর মেয়াদী একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে। এ প্রকল্পের উলে-খযোগ্য দিক হচ্ছে– নারীবিষয়ক নানাধর্মী তথ্যের একটি ব্যাপকভিত্তিক তথ্যভাণ্ডার সৃষ্টি করা। যেমন– স্বাস্থ্যসেবা, কর্মসংস্থান, ব্যবসায়-বাণিজ্য, প্রশিক্ষণ, কর্মজীবন, সেবা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষার সুযোগ, রান্নাবান্না, কেনাকাটা, শিশুযত্ন, সাজসজ্জা, আইনী সহায়তা, নারীর অধিকার আদায় এবং এ ধরনের আরও নানা তথ্য। এসব বিষয়ে তথ্যের সহজলভ্যতা সুবিধাবঞ্চিত নারীসমাজের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি উলে-খযোগ্য হারে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে বলে আশা করা যায়। প্রকল্পের আওতাধীন কেন্দ্রসমূহ রয়েছে ভৈরব, কোটালীপাড়া, মতিরাঙ্গা, সেনবাগ, দেবীদ্বার, পত্নীতলা, মোল-াহাট, তেঁতুলিয়া, গৌরনদী এবং গোবিন্দগঞ্জে। ১০টি উপজেলায় ১০টি কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে ১ লাখ মহিলাকে সংবেদনশীল ও সচেতন করে তোলা, প্রকল্পের নিয়োজিত তথ্য সহকারী এবং শহরতলি ও গ্রামাঞ্চলের ৬ হাজার মহিলাকে প্রশিক্ষণ দেয়া, তথ্যপ্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনায় মহিলাদের দক্ষ করে তোলা এবং তথ্যপ্রযুক্তি ও এর ব্যবস্থাপনাসংশি-ষ্ট কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়নই এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

জাতীয় মহিলা সংস্থার নিজস্ব ওয়েবসাইট www.jms.gov.bd নিয়ে আপনাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী?

জাতীয় মহিলা সংস্থার নিজস্ব ওয়েবসাইটের মাধ্যমে এই সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। অচিরেই বিভিন্ন কার্যক্রম প্রচারের লক্ষ্যে ভিডিও গ্যালারি গড়ে তোলা হবে। নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ বাস্তবায়নের তাগিদে মানববন্ধন, র‌্যালি ও সমাবেশের ওপর ভিডিওচিত্র সাইটে দেয়া হয়েছে, যা জনমত তৈরিতে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

'মেয়েরা তথ্যপ্রযুক্তির যেকোনো ক্ষেত্র বেছে নিতে পারেন'

লুনা শামসুদ্দোহা

চেয়ারম্যান, দোহাটেক নিউ মিডিয়া ও সভাপতি, বাংলাদেশ উইমেন ইন টেকনোলজি

বাংলাদেশে আইসিটি সেক্টরে খুব বেশি নারী উদ্যোক্তা নেই। এর পেছনে কী কারণ আছে বলে আপনি মনে করেন?

আইসিটি একটি অত্যন্ত জটিল সেক্টর। এখানে ঝুঁকির পরিমাণ খুব বেশি। এই সেক্টরে সফল হতে হলে একজন উদ্যোক্তাকে একটি সুনির্দিষ্ট ব্যবসায়িক পরিকল্পনা নিয়ে নামতে হবে। বাংলাদেশে অনেক সুযোগ আছে এবং একজন উদ্যোক্তা কী ধরনের ব্যবসায় ভালো করতে পারবেন, তা নিজেকেই চিহ্নিত করতে হবে। তবে আশার কথা হলো, বাংলাদেশে নারী উদ্যোক্তারা এগিয়ে আসছেন এবং ভবিষ্যতে আইসিটি ইন্ডাস্ট্রি যত বেশি স্থিতিশীল হবে এবং আকার যত বাড়তে থাকবে, তত বেশি নারী উদ্যোক্তা এই সেক্টরে এগিয়ে আসবেন। তথ্যপ্রযুক্তিতে নারী-পুরুষ বলে কোনো কথা নেই। আমাদেরকে দেখতে হবে আইসিটি সেক্টরে চাহিদা কী এবং সেই অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। বাংলাদেশে ছেলেমেয়েরা একই ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হন। যেমন– অভিজ্ঞ শিক্ষকের অভাব, পর্যাপ্ত বইপত্র, কমপিউটার এবং অন্যান্য উপকরণের অভাব।

যেসব নারী আইসিটিতে তাদের ক্যারিয়ার গড়তে চান তাদের প্রতি আপনার উপদেশ কী?

তাকে একটি ক্যারিয়ার প্ল্যান তৈরি করতে হবে এবং ভবিষ্যতে যে দায়িত্ব পালন করতে ইচ্ছুক তার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে। আরও যা করতে হবে : প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভ করতে হবে এবং ভবিষ্যৎ কর্মক্ষেত্রে নিজের অবস্থান সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে; সবসময় শেখার এবং জানার মানসিকতা থাকতে হবে এবং প্রাসঙ্গিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে হবে; এই নিয়ত পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে দেশের অভ্যন্তরে এবং বিদেশে যোগাযোগ গড়ে তুলতে হবে; ইংরেজি অথবা অন্য একটি বিদেশী ভাষা যেমন– জার্মান, জাপানি বা কোরিয়ান ভাষাতে ভালোভাবে দক্ষতা অর্জন করতে হবে; উদ্ভাবনীশক্তি থাকতে হবে এবং এক্ষেত্রে প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ নিতে হবে; কাজকর্মের ক্ষেত্রে নিষ্ঠাবান হতে হবে এবং সঠিক আচার-আচরণ মেনে চলতে হবে; দলগতভাবে কাজ করার দক্ষতা থাকতে হবে; টেকনিক্যাল রাইটিং এবং প্রেজেন্টেশন তৈরি করা শিখতে হবে; মেধাস্বত্ব ও নৈতিক মূল্যবোধকে সম্মান করতে হবে এবং নেতৃত্ব দিতে শিখতে হবে।

নারীদের আইসিটি সেক্টরে আসতে উৎসাহিত করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের কী কী পদক্ষেপ নেয়া উচিত?

সবার আগে বাংলাদেশ সরকারকে একটি নিবিড় প্রচার কর্মসূচি হাতে নিতে হবে, যার মাধ্যমে বিভিন্ন স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদেরকে বিজ্ঞান বিষয়ে পড়তে উৎসাহিত করা হবে। তবে একে শুধু প্রচার কর্মসূচির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না বরং সব সরকারি মহল থেকে জোর প্রচেষ্টা চালাতে হবে। সরকারকে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে উপযুক্ত অবকাঠামো তৈরি, উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ এবং উন্নত সিলেবাস তৈরি করার ব্যাপারে যত্নশীল হতে হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ ব্যাপারে খুবই উৎসাহী এবং প্রয়োজনীয় সব ধরনের দিকনির্দেশনা দিয়েছেন।

প্রতিবছর দেশব্যাপী স্কুলগুলো থেকে প্রচুর মেয়ে শিক্ষার্থী বের হচ্ছেন, যারা জাতির জন্য উন্মোচন করতে পারেন সম্ভাবনার অবারিত দুয়ার। নারী দিবস ২০১১-এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের আলোকে বাংলাদেশ সরকারের উচিত মেয়েদেরকে আরও বেশি করে বিজ্ঞান, গণিত ও ইংরেজি পড়তে উৎসাহিত করা এবং প্রযুক্তি ক্ষেত্রে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেয়ার মাধ্যমে তাদেরকে গতিশীল করতে হবে। কারণ, একবিংশ শতাব্দীতে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে অসামান্য প্রবৃদ্ধি ঘটবে এবং এটি ঘটবে দ্রুতগতিতে, কিন্তু কোনোভাবেই আমাদের এই সুযোগ হারানো চলবে না। তাই আমাদেরকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে ভবিষ্যৎ নির্মাণে সচেষ্ট হতে হবে। আমাদের 'বাংলাদেশ উইমেন ইন টেকনোলজি' ফোরামও মেয়েদেরকে আইসিটি সেক্টরে কাজ করতে উৎসাহ দিয়ে থাকে।

তথ্যপ্রযুক্তির কোন ক্ষেত্রটিতে বাংলাদেশের নারীদের সফল হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি বলে আপনি মনে করেন?

আমি আগেই উল্লেখ করেছি, প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ বলে কোনো কথা নেই। মেয়েরা তথ্যপ্রযুক্তির যেকোনো ক্ষেত্রকে বেছে নিতে পারেন এবং তাতে সফলতা লাভ করতে পারেন। দরকার হলো তারা কোন ক্ষেত্রে কাজ করতে চান, সেটা তাদেরকে বুঝতে হবে। একই সাথে নতুন কিছু করার মানসিকতা থাকতে হবে। তাদেরকে নিজেদের জন্য একটি জায়গা তৈরি করে নিতে হবে।

বিভিন্ন ফিচার বা নতুন অফার পরিকল্পনা করার সময় নারীদের কথা বিশেষভাবে বিবেচনায় আনা হয়। অতএব বলা যায়, নারীদের ব্যাপারে নারীরাই ভালো সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। ফলে ভবিষ্যতে সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং ও ই-কমার্স সাইটগুলোতে নারী চাকরিজীবীর সংখ্যা আরও বেড়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রসঙ্গ : বাংলাদেশ

আইসিটি খাতে নারীদের নিয়ে এত হতাশার মাঝেও আশার আলো হয়ে রয়েছে বাংলাদেশের সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নেয়া বেশ কিছু পদক্ষেপ। প্রথমে আসা যাক সরকারি পদক্ষেপের কথায়। বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে কয়েকটি প্রকল্প রয়েছে। এগুলোতে সরাসরি বাংলাদেশের মহিলাদের ভাগ্যোন্নয়নে আইসিটিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে জাতীয় মহিলা সংস্থার একটি প্রকল্পের নাম 'জেলাভিত্তিক মহিলা কমপিউটার প্রশিক্ষণ'। ১৬ কোটি ৭৫ লাখ টাকা ব্যয়ের এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য শিক্ষিত মহিলাদের তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষার মাধ্যমে কর্মসংস্থান এবং যোগাযোগ প্রযুক্তিনির্ভর উদ্যোক্তা হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা। এ প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে নিচের ওয়েবপেজে : http://www.jms.gov.bd/bn/it-training

এই প্রকল্পের লক্ষ্য ১৫ হাজার শিক্ষিত মহিলাকে কমপিউটার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মসংস্থান ও আর্থিক স্বনির্ভরতা অর্জনে সহায়তা করা। প্রকল্প শেষ হওয়ার পর এর সাফল্য ও ব্যর্থতা সম্পর্কে হয়তো আমরা আরও বিস্তারিত তথ্য পাব। তবে বর্তমান সরকারের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' ভিশনের সূত্র ধরে আমরা অদূর ভবিষ্যতে ই-গভর্নেন্সের যত বিস্তার দেখতে পাব ততই হয়তো মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মহিলা ও শিশুদের জন্য এ ধরনের আইসিটি প্রজেক্ট আরও বেশি দেখতে পাব।

জাতীয় মহিলা সংস্থা আরেকটি প্রকল্প সামনে বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে। তিন বছর মেয়াদী এই প্রজেক্টের নাম হচ্ছে 'তথ্য আপা'। এর পুরো নাম 'তথ্য আপা : ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন প্রকল্প'। দেশের দশটি উপজেলাকে চিহ্নিত করা হয়েছে ও এসব উপজেলায় কিছু নারীকে নির্বাচিত করা হবে। তাদেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তথ্য ও জ্ঞানের রাজ্যে সহজে প্রবেশ নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হবে। 'তথ্য আপা' প্রযুক্তির অধীনে একটি নারীর জন্য ডিজিটাল তথ্যভাণ্ডার গড়ে তোলা হবে এবং গ্রাম ও শহরের সব নারী সেই ডিজিটাল তথ্যভাণ্ডারে প্রবেশাধিকার পাবেন। এর মাধ্যমে মহিলাদের তথ্য পাওয়ার অধিকার কিছুটা হলেও নিশ্চিত হবে। তারা তাদের নিজেদের বিভিন্ন অধিকার সম্পর্কে সচেতন হবেন।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একটি ভালো দিক হচ্ছে এর ওয়েবসাইট : http://www.mowca.gov.bd। এ ওয়েবসাইটটিতে রয়েছে 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১'। এটি নিয়ে গত কয়েক মাস ধরে রাজনৈতিক ময়দান কিছুটা উত্তপ্ত ছিল। বিভিন্ন ব্লগ, ফোরাম ও ফেসবুকে অনেক আলোচনা হয়েছে এবং এখনও চলছে। তাই অনেকেই 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১'-এ আসলে কী বলা আছে, তা এ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জানার সুযোগ পেয়েছেন। এতে করে অনেকেই সঠিক বিষয়টি জানতে পেরেছেন।

জাতীয় মহিলা সংস্থার ওয়েবসাইটটিও বেশ কাজের : http://www.jms.gov.bd। এখানে সব প্রকল্পের ওপর তথ্য থাকার পাশাপাশি টেন্ডারের বিজ্ঞাপনও রয়েছে। মহিলা বিষয়ক অধিদফতরের ওয়েবসাইটের ঠিকানা হলো : http://www.dwa.gov.bd/

তথ্য-কল্যাণী

সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি পর্যায়ে আইসিটিতে নারীদের সম্পৃক্ততা বাড়ানোর জন্য অনেক কাজ হচ্ছে। এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে ডিনেট। এ প্রতিষ্ঠানটির তথ্য-কল্যাণী তথ্য ▶

ইনফোলেডি প্রকল্প দেশে ও বিদেশে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। বিবিসির একটি রিপোর্টে বলা হয় : 'বাংলাদেশের কিছু গ্রামে এখন দেখা যায় অন্যরকম এক দৃশ্য। সাইকেল চালিয়ে একজন তরুণী যাচ্ছেন মানুষের বাড়ি বাড়ি, তার সাথে ল্যাপটপ, কমপিউটার বা নেটবুক। তিনি ইন্টারনেট ব্যবহার করে স্বাস্থ্যসেবা দিচ্ছেন, কখনও গ্রামের মেয়েদের বা স্কুলের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা শেখাচ্ছেন কীভাবে ব্যবহার করতে হয় কমপিউটার। এদের নাম দেয়া হয়েছে 'ইনফো-লেডি' বা 'তথ্য-কল্যাণী'। তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক সেবাকে তারা নিয়ে যাচ্ছেন সরাসরি গ্রামীণ জনগণের দোরগোড়ায়।

সাইকেল, ল্যাপটপ আর চিকিৎসা যন্ত্রপাতি নিয়ে তথ্য-কল্যাণীরা গ্রামে ঘুরে ঘুরে লোকজনকে দিচ্ছেন ইন্টারনেটভিত্তিক নানারকম সেবা। (http://www.bbc.co.uk/bengali/in_depth/2010/03/100304_benspower_info-ladies.shtml)

তথ্য-কল্যাণী নিয়ে ব্রিটেনের শীর্ষস্থানীয় পত্রিকা গার্ডিয়ানেও রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে।

এনজিও সেক্টরে আরেকটি উল্লেখযোগ্য প্রকল্প হলো ইন্টারনেটভিত্তিক স্তন ক্যান্সার চিকিৎসা কর্মসূচি। বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ এডুকেশন সোসাইটির (বিএফইএস) 'আমাদের গ্রাম' প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত এটি। বাংলাদেশে স্তন ক্যান্সার নিয়ে তেমন সচেতনতা গড়ে ওঠেনি। আর গ্রামের মহিলারা এ ক্ষেত্রে চরমভাবে অবহেলিত।

বাংলাদেশ উইমেন ইন টেকনোলজি

বাংলাদেশ উইমেন ইন টেকনোলজি তথা বিডব্লি-উআইটি সেই সব নারীদের সংগঠন, যারা কোনো না কোনোভাবে বাংলাদেশের আইসিটি খাতের সাথে জড়িত। বাংলাদেশে প্রযুক্তি খাতে পেশাগতভাবে জড়িত নারীদের এটি প্রধান সংগঠন। এ সংগঠনের ওয়েবসাইটের ঠিকানা : http://bwit-bd.com। এই সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য আইটি খাতের সাথে জড়িত নারীদেরকে একত্রিত করে তাদের পরিচিতির ব্যবস্থা করা। তাদের জন্য নতুন নতুন সুযোগ তৈরি করা। এ ছাড়া এই সংগঠনটি তরুণীদের তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পকে পেশা হিসেবে বেছে নিতে এবং এই শিল্পে উদ্যোগী হতে উৎসাহিত করে থাকে। নারী উদ্যোক্তা এবং পেশাজীবীদের আইসিটিতে সাফল্য অর্জনের জন্য নেতৃত্ব গুণাবলীসহ অন্যান্য দক্ষতা বাড়ানোর সর্বাত্মক চেষ্টাও করা হয় এই সংগঠনটির পক্ষ থেকে।

বিডব্লি-উআইটির মিশন হচ্ছে বাংলাদেশে নারীদেরকে প্রযুক্তি শিল্পে ক্যারিয়ার গড়তে উৎসাহিত করা এবং প্রযুক্তি বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানোর পাশাপাশি নারীদেরকে শিক্ষা, নেতৃত্ব দক্ষতা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দিয়ে তাদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা।

অতএব যেসব নারী বর্তমানে বাংলাদেশের আইসিটি খাতের সাথে সংশি-ষ্ট তারা খুব সহজেই বিডব্লি-উআইটির সদস্য হতে পারেন এবং এতে করে তাদের জন্য এই শিল্পে সাফল্য অর্জনের নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি হবে। তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে জড়িত উদ্যোক্তা পেশাজীবী নারীরা এই সংগঠনের সদস্য হওয়ার জন্য উপযুক্ত।

বাংলাদেশে যা করা উচিত

বাংলাদেশে আইসিটি খাতে নারীর অংশ নেয়া এবং অন্যদিকে নারীর অবস্থার উন্নয়নের জন্য আইসিটির ব্যবহার- এ দুটি বিষয়কেই গুরুত্বের সাথে নিতে হবে। এ দুটি বিষয়কে আলাদাভাবে বিবেচনা করার কোনো অবকাশ নেই। এক্ষেত্রে দায়িত্ব রয়েছে সরকারের, আবার বেসরকারি খাতেরও দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার কোনো উপায় নেই। তাছাড়া গণমাধ্যমের অনেক কিছু করার রয়েছে। সবার সামাজিক প্রচেষ্টা ও অংশ নেয়ার মাধ্যমে এ দুটি ক্ষেত্রেই উন্নয়ন সম্ভব। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ হয়ে উঠতে পারে এশিয়ার জন্য এক উজ্জ্বল উদাহরণ। বাংলাদেশ যদি এ খাতে চেষ্টা করে তবে সারা বিশ্বেই বাংলাদেশ হয়ে উঠতে পারে অগ্রপথিক।

প্রথমেই বলতে হয় শিক্ষার কথা। এক্ষেত্রে ▶

'বাবা-মা-শিক্ষক সবাই মনে করেন মেয়েরা বিজ্ঞান-গণিত কম পারেন'

ড. অনন্য রায়হান
নির্বাহী পরিচালক, ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ নেটওয়ার্ক

বাংলাদেশে আইসিটি খাতে মেয়েরা এখনো সেভাবে এগিয়ে আসেছে না কেনো?

আমার মনে হয়, বিষয়টি অন্যান্য আর্থ-সামাজিক বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত। মেয়েদেরকে বিজ্ঞান শিক্ষায় উৎসাহিত করা হয় না। তার মানে শুরুটা হয় ওইখান থেকে। ডি.নেট থেকে আমরা একটা সমীক্ষা চালিয়েছিলাম 'জেন্ডার অ্যান্ড আইসিটি'র ওপর। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এই স্টাডিটা হবে কো-এডুকেশন স্কুল অথবা মেয়েদের স্কুল নিয়ে। তা করতে গিয়ে দেখা গেল, বাবা-মা যেরকম মনে করেন যে মেয়েরা বিজ্ঞান, গণিত কম পারেন, তেমনি অনেক শিক্ষকও তাই মনে করেন। তার ফলে মেয়েরা এক সময় মনে করতে শুরু করেন এটা আসলে তাদের জন্য নয়, তবে কিছু কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে। কিছু কিছু বাবা-মাও ব্যতিক্রমী, যারা মনে করেন ছেলেরা পারলে মেয়েরা কেন পারবেন না।

কিভাবে এ অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব বলে আপনি মনে করেন?

আসলে আমরা অনেক সময় যুক্তিসঙ্গত কারণেই বিরোধিতা করি যে কোটাপ্রথা সব সময় মেধাকে উৎসাহিত করে না বরং মেধাহীন যারা তাদেরকে উৎসাহিত করে। কিন্তু আমার মনে হয় মেয়েদেরকে তথ্যপ্রযুক্তি খাত শুধু নয়, সার্বিকভাবেই দেশের উন্নয়নের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূলধারায় নিয়ে আসতে গেলে বিশেষ কর্মসূচি দরকার। যেমন- একটা কর্মসূচি আছে মেয়েদের গ্র্যাজুয়েশন পর্যন্ত লেখাপড়া বিনামূল্যে দেয়া হচ্ছে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে। আমি মনে করি এটা খুবই ভালো উদ্যোগ। গ্রামে আমি অনেক মেয়েকে দেখি শুধু এই ব্যবস্থার কারণে তারা পড়তে পারছেন। বাবা-মাও উৎসাহিত হচ্ছেন যে আমাদের পকেট থেকে যেহেতু খরচ হচ্ছে না, ঠিক আছে পড়ুক না ডিগ্রি পর্যন্ত। এরকম উদ্যোগ আসলে খুব দরকার। এটা সরকারের তরফ থেকে হতে পারে বা ডেভেলপমেন্ট পার্টনারেরা করতে পারে। বেসরকারি খাতও এক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখতে পারে।

আইসিটি খাতে মেয়েদের বেশিরভাগই ঢাকা শহরে সীমাবদ্ধ। 'বাংলাদেশ উইমেন ইন টেকনোলজি'র সব সদস্যই কিন্তু ঢাকায় কর্মরত। গ্রামে এই অবস্থাটা কেমন?

গ্রামে অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। এক্ষেত্রে আমি ব্র্যাকের যে গণকেন্দ্র পাঠাগার রয়েছে তার উল্লেখ করতে চাই। সারা দেশে তাদের যে ২ হাজারেরও বেশি গণকেন্দ্র পাঠাগার রয়েছে, সেখানে মেয়েরা সুযোগ পাচ্ছেন। এখন ওদের প্রায় ৭ শয়েরও বেশি কেন্দ্রে তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক সেবা ও প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। ডি.নেটের প্রায় সব কর্মকাণ্ডে আমরা নিশ্চিত করেছি প্রত্যেকটি কেন্দ্রে কমপক্ষে একজন মেয়ে থাকবেন। অন্য পদে ছেলে কিংবা মেয়ে থাকতে পারেন, কিন্তু এটা নিশ্চিত করা হয় কমপক্ষে একজন নারী থাকবেনই।

পাশাপাশি ২০০৫ সালে আমরা যখন 'এক্সপ্লানেশন প্রোগ্রাম' শুরু করলাম যেখানে তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে তথ্যসেবা দেয়া হতো, তখন দেখতাম তথ্যকেন্দ্রে মূলত ছেলে এবং বয়স্করা আসতেন। মেয়েরা খুব কম আসতেন এবং তারা মূলত বিদেশে অবস্থানরত আত্মীয়স্বজনদের সাথে কথা বলার জন্যই আসতেন। এর বাইরে মেয়েরা তেমন আসতেন না। তখন আমরা গ্রামেরই একটা শিক্ষিত মেয়েকে বাছাই করলাম। তার দুটি ভালো গুণ ছিল। একটি হচ্ছে দ্রুত শিখে নিতে পারেন এবং অপরটি খুব ভালো যোগাযোগ রক্ষা করতে পারেন। তথ্যপ্রযুক্তির শিক্ষাটাকে কিন্তু আমরা সেখানে গুরুত্ব দেইনি। কারণ এটা শিখে নেয়া সম্ভব। ওই রকম কিছু মেয়েকে আমরা বেছে নিই যারা কেন্দ্রগুলোর এক্সটেনশন হিসেবে কাজ করবেন এবং বাড়ি বাড়ি যাবেন। যেখানে মেয়েরা আসছেন না সেখানে তাদের বাড়িতে গিয়ে সার্ভিসটা দেয়ার চেষ্টা করবেন। প্রথমে আমরা মোবাইল ফোন দিয়ে শুরু করি। মেয়েরা আসলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সমস্যা নিয়ে কথা বলতে চান এবং এ সম্পর্কে ডাক্তারের পরামর্শ চান। আরেকটি বিষয় হলো পারিবারিক নির্যাতন, যেগুলো নিয়ে তারা সামনাসামনি কথা বলতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন না। কিন্তু মোবাইল ফোনে আমরা দেখলাম তারা অনেক কথাই অকপটে বলছেন, যেগুলো সামনাসামনি হয়ত আরেকটা মেয়েকেও বলতে চাইতেন না। অর্থাৎ মোবাইল ফোনের মাধ্যমে নিজের পরিচয় গোপন রেখে তারা তাদের সমস্যাগুলো নিয়ে কথা বলতে আগ্রহী। এটা ছিল আমাদের একটি বড় উপলব্ধি। ■

সরকারেরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সরকার কমপিউটার বিজ্ঞানে যেসব মেয়ে পড়বেন তাদের জন্য আলাদা বৃত্তির ব্যবস্থা করতে পারে। উল্লেখ্য, মেয়েদের শিক্ষায় উৎসাহিত করার জন্য ইতোমধ্যেই সরকারের বেশ কিছু ব্যবস্থা রয়েছে। তাই এটি করা হলে কোনো ব্যতিক্রমধর্মী কিছু করা হবে না।

চাকরি ক্ষেত্রেও সরকার নারীর জন্য আলাদা কিছু কোটা রেখেছে। সেই কোটা আইসিটি খাতের সাথে সম্পর্কিত চাকরিগুলোতে ঠিকমতো পালন করা হয় কি না, তবে দেখতে হবে। তাছাড়া বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও কোম্পানিগুলোকেও মেয়েদেরকে নিয়োগে উৎসাহ দেয়া যেতে পারে। তবে এটা বাস্তবতা যে, বেসরকারি যেকোনো প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি তাদের লাভের কথা চিন্তা করবে। তারা চাকরি দেয়ার সময় নারী বা পুরুষের কথা চিন্তা করবে না। তাই নারীদের জন্য যেসব চাকরি উপযোগী সেসব ব্যাপারে সরকার অবকাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে পারে। কলসেন্টারের কথা সবার আগেই বলতে হয়। ভারতে কলসেন্টারে যারা কাজ করছেন, তাদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশই মেয়ে। কলসেন্টারের কাজ রাতের বেলায় করতে হয়। ঢাকা বা চট্টগ্রামের মতো বড় বড় শহরে রাত ১১-১২টার পরও মেয়েরা স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপদে চলাচল করতে পারবেন, সে প্রশ্ন থেকে যায়। এক্ষেত্রে সরকারের অনেক কিছুই করার রয়েছে। আউটসোর্সিং খাত বিকশিত হচ্ছে ধীরে ধীরে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনেক চাকরির সুযোগ তৈরি হবে মেয়েদের জন্য। মেয়েদের একটা বড় অংশকে এখনও ঘরেই থাকতে হয় বিয়ের পরে। তাই ইন্টারনেটের মাধ্যমে তারা যদি কর্মের সুযোগ পান অনেকের জন্য তা খুব সহায়ক হবে। এক্ষেত্রে সরকারের পেপালকে বৈধতা দেয়ার মতো আউটসোর্সিং খাতকে আরও সুযোগসুবিধা দিলেই হবে। এতে করে দেশের যেমন রফতানি আয় বাড়বে, ঠিক তেমনি আইসিটিতে মেয়েদের অংশ নেয়াও উল্লেখযোগ্য হারে বাড়বে। মেয়েদের মধ্যে নারী উদ্যোক্তা বাড়ানোর জন্য আমরা গত কয়েক বছর ধরে সরকারি খাতে বিভিন্ন ধরনের প্রয়াস দেখতে পাচ্ছি। বিশেষত এসএমই খাতে ঋণ দেয়ার জন্য সরকার ব্যাংকগুলোকে বুঝানোর চেষ্টা করেছে এবং এসএমই ফাউন্ডেশনও গড়ে উঠেছে। এসএমই ফাউন্ডেশন নারী উদ্যোক্তাদের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এ সবকিছুই ইতিবাচক লক্ষণ। তবে নারীর জন্য আইসিটি খাতে ঋণ পাওয়াটা আরও সহজ করতে হবে।

‘গ্রাম ও মফস্বলের মেয়েরা আউটসোর্সিংয়ের কাজ করতে পারেন’

রেজা সেলিম, প্রকল্প পরিচালক, আমাদের গ্রাম

‘আমাদের গ্রাম’ নারীদের নিয়ে কাজ করছে। গ্রামের মেয়েদের প্রযুক্তি ব্যবহারে আপনাদের কী ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছে?

আমরা যে প্রজেক্ট হাতে নিয়েছি সেখানে ইন্টারনেটের মাধ্যমে স্তন ক্যান্সারের চিকিৎসা বিষয়ে সহায়তা দেয়া হয়। এখানে যারা কাজ করছেন তারা সবাই নারী এবং তারা কমপিউটার, ইন্টারনেট, ল্যাপটপ এবং মোবাইল ফোন ব্যবহার করছেন। আপনি শুনলে অবাক হবেন, এদের প্রায় সবাই একেবারে গ্রাম থেকে এসেছেন। দুয়েকজন হয়তো শহর থেকে এসেছেন ঠিকই, তবে সবাই একেবারে গ্রাম থেকে এসেছেন। কিন্তু তাই বলে তাদের আইসিটি ব্যাপারে আগ্রহ কোনো অংশেই কম নয়।

মহিলাদের স্তন ক্যান্সার বিষয়ে আপনাদের যে প্রজেক্ট রয়েছে সে সম্পর্কে কিছু বলেন?

আমরা খুলনা বিভাগে ইতোমধ্যে প্রায় ৬ হাজার নারীর স্তন ক্যান্সার বিষয়ে পরীক্ষা সম্পন্ন করেছি। এর মাধ্যমে মহিলারা ঢাকা ও বহির্বিশ্বের চিকিৎসকদের পরামর্শ পেয়েছেন। তবে এই ৬ হাজারের মধ্যে প্রায় আড়াইশ নারীকে আমরা স্তন ক্যান্সার রোগী হিসেবে শনাক্ত করতে সমর্থ হই এবং তাদেরকে চিকিৎসার ব্যাপারে যতটুকু সহায়তা করা সম্ভব আমরা তা করছি। পুরো কাজটিই হয়েছে ইন্টারনেটপ্রযুক্তির মাধ্যমে। আমরা প্রতিটি রোগীর তথ্য নিয়ে ডাটাবেজ তৈরি করেছি এবং সেই ডাটাবেজের তথ্য পরবর্তীতে তারা যেকোনো প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারবেন। পুরো কাজটিই করছেন নারী প্রযুক্তিকর্মীরা। এরা ল্যাপটপ ও মোবাইল ফোন ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করেন।

গ্রামের মেয়েদের কমপিউটার শিক্ষার ব্যাপারে আপনারা কোনো উদ্যোগ নিয়েছেন কী?

আমরা শুধু গ্রামের মেয়ে নয়, ছেলেদেরও কমপিউটার শিক্ষা দিয়ে থাকি এবং এ পর্যন্ত ৬-৭ হাজার ছেলেমেয়ে কমপিউটার শিখেছেন। তাদের কেউ কেউ কমপিউটারকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন।

মফস্বল শহর ও গ্রামের মেয়েদেরকে দিয়ে কী আউটসোর্সিংয়ের কাজ করানো সম্ভব?

অবশ্যই সম্ভব এবং এজন্য আমাদেরকে সৃজনশীল চিন্তা করতে হবে। আউটসোর্সিং বলতে আমরা অনেকেই শুধু বিদেশ থেকে কাজ এনে তা দেশের মধ্যে করার চিন্তা করি, কিন্তু আউটসোর্সিং দেশের মধ্যেও হতে পারে। যেমন- ঢাকা শহরে প্রতিদিন নানা কাজে বিভিন্ন ধরনের অডিও রেকর্ড করা হয়, সেগুলোকে ট্রান্সক্রিপশনের জন্য ঢাকার বাইরে পাঠিয়ে দেয়া যায়। আমাদের অনেক মেয়ে রয়েছেন যারা এ ধরনের কাজে বেশ দক্ষ এবং পারদর্শী। তারা একই সাথে অনেকে অল্প পারিশ্রমিকে কাজ করতে আগ্রহী। তাই তাদেরকেও যদি ঢাকা থেকে অডিও ফাইল ইন্টারনেটের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেয়া যায় তবে তারা হয়তো কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সেগুলোকে টাইপ করে এবং ভুলভ্রান্তি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পাঠিয়ে দিতে পারবেন এবং খরচও ঢাকার তুলনায় অনেক কম হবে। তাই আমাদেরকে এসব ব্যাপারে সৃজনশীল হতে হবে। মেয়েদের দিয়ে সম্ভব বলছি এ জন্যই যে, ইতোমধ্যে আমাদের মেয়েরা একটি কাজ করেছেন যা ছিল একটি ৬শ পৃষ্ঠার আন্তর্জাতিক বইয়ের প্রকাশনা ট্রান্সক্রিপশন থেকে টাইপ করা। তাই এটি একটি শুধু উদাহরণ। এ বিষয়ে আরও ব্যাপক গবেষণা হওয়া দরকার এবং কোন কোন খাতে শুধু বিদেশ থেকে নয় বরং ঢাকার মতো বড় বড় শহর থেকে কমপিউটার প্রযুক্তিনির্ভর কাজ মফস্বল ও গ্রামের মেয়েদেরকে আউটসোর্স করে দেয়া যায় সে সম্পর্কে আমাদেরকে আরও চিন্তাভাবনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে।

বাংলাদেশে এখনও গ্রামের নারীরা অবহেলিত। অনেক ক্ষেত্রেই আইনকানুন না জানার ফলে লাঞ্ছনার শিকার হন। শহরের নারীদের অবস্থা কিছুটা ভালো হলেও খুব যে ভালো, তাও নয়। তাছাড়া বাংলাদেশের মেয়েদের অধিকার কী আছে এবং আইনে কী বলা আছে, সে সম্পর্কিত তথ্য খুব সহজেই যে সব জায়গায় পাওয়া যায়, তা নয়। সে জন্য নারী অধিকার সম্পর্কিত যত আইনকানুন ও অন্যান্য সরকারি ব্যবস্থা রয়েছে সব নিয়ে একটি ওয়েবসাইট এবং তার সিডি ও ভিডিও ভার্সন করা যেতে পারে। এ সম্পর্কিত তথ্য সরকারের মহিলা মন্ত্রণালয় চাইলেই করতে পারে এবং তারপর এ তথ্যগুলো যদি মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলোর মাধ্যমে দেয়া যায় তাহলে হয়তো একটি এসএমএস অথবা কোনো বিশেষ নাম্বারে কল করে যেকোনো নারী বাংলাদেশের যেকোনো প্রান্ত থেকে খুব সহজেই অন্তত তাদের অধিকার রক্ষায় যেসব আইনকানুন রয়েছে সে সম্পর্কে জানতে পারবেন। এতে করে তাদের তথ্য অধিকার পাওয়া অনেক বেশি করে নিশ্চিত হবে।

আইসিটি খাতে যারা রয়েছেন, তাদের একটি প্ল্যাটফর্ম ইতোমধ্যেই গড়ে উঠেছে- এ কথা আগে বলা হয়েছে। কিন্তু তাদের সদস্যসংখ্যা এখনও অত্যন্ত কম এবং হয়তো তাদের বাজেটের অভাবে তারা তেমন কর্মসূচি পালন করতে পারছেন না। এদিকটিতে শুধু সরকার নয়, বরং এনজিওগুলোর এগিয়ে আসা উচিত। তাছাড়া এ প্ল্যাটফর্মে সারা দেশের আইসিটি খাতে জড়িত সব নারীকেই অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

সামনে থ্রিজি ইন্টারনেট আসছে। বর্তমান সরকার ই-গভর্নেন্সের কথাও বারবার বলছে। তাই থ্রিজি ইন্টারনেট আসার পর সারা দেশের নারীদেরকে কীভাবে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সরকারি বিভিন্ন সেবা আরও সহজে দেয়া যায়, সে দিকটাও কর্তাব্যক্তিরা ভাবতে পারেন।

বিভিন্ন ব্লগের মাধ্যমে এখন বাংলাদেশের অনেকেই লিখছেন। কিন্তু গ্রামের তৃণমূল পর্যায়ে নারীদের কথা তেমন বা একেবারেই উঠে আসছে না। তাদের কথা যাতে এ ধরনের ব্লগগুলোতে এবং বিভিন্ন ওয়েবসাইটে তুলে ধরা যায় সে দিকটাতেও অনেক কিছু করার রয়েছে।

সবশেষে যেটা মনে হয় তা হচ্ছে- যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কমপিউটার, ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন এসব জিনিসকে দামী বা বিলাসিতার পণ্য হিসেবে না দেখে আমাদের সবারই নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য হিসেবে দেখতে হবে। তাহলে আশাব্যঞ্জক অগ্রগতি সাধিত হবে খুব অল্প সময়ের মধ্যে।

ফিডব্যাক : ahmed_razib@yahoo.com